أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا
يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ
أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ
نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ
الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

سورة الصّٰفّٰت مكية وهي مائة واثنتان وثمانون آية وخمس ركوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

(৭১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক। (৭২) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনী রূপে ধৃত হয়ে আসবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। (৭৮) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? (৭৯) বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮০) যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (৮১) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা আস্-সাফ্‌ফাত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৮২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তাআলার নামে শুরু—

(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, (২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতিপ্রদর্শনকারীদের, (৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের—

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

— আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ্ তাআলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ্ তাআলা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রী করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্‌র দান, পুঁজি ও শ্রম নয় ঃ আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেসোরে আলোচনা চলছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় পুঁজি মূল কারণ, না শ্রম? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা শ্রমকে মালকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় এতদুভয়ের কোনই প্রভাব নেই। কোন বস্তুর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবী এই যে, যে যে বস্তু সৃষ্টি করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল ও সত্যিকার মালিকানা জগতের বস্তুনিচয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলারই। যে কোন বস্তুর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র দানের কারণে হতে পারে। বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোন বস্তুর মালিক হতে পারে না।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোন বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দান।

وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ এখানে جُندٌ এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর এই যে, কাফেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হেফাযত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা

মূর্তিদের নেই।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ — সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী শো'আবুল-ঈমান এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ্ তাআলা একেও জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন।— (ইবনে-কাসীর)

خَصِيمٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ, নিকৃষ্ট বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহ্র কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে!

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ضرب مثل (দৃষ্টান্ত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছেঃ

وَنَسِيَ خَلْقَهُ অর্থাৎ, এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টি তত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিকৃষ্ট, নাপাক ও নিষ্প্রাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে খোদায়ী কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।— (কুরতুবী)

এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাইঃ

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

— অর্থাৎ, তোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে তোমরা প্রজ্জ্বলিত করে কাজে লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি?

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে شجر শব্দের সাথে اخضر (সবুজ) বিশেষণ উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরী করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতঃপর কারিগর ডাকে, অতঃপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বাঞ্ছিত বস্তুটি তৈরী হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে 'হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষণিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়,তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্ট করা হয়। এমতাবস্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে كُن (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়।

সূরা আস্-সাফফাত

সূরার বিষয়বস্তু ঃ এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার মত এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তওহীদ, রেসালত ও আখেরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত লূত (আঃ) ও হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্র কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে।

إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا
مِّن كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ
مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم
مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنٰهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ
هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دٰخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هٰذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ إِلٰى
صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ
هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

(৪) নিশ্চয় তোমাদের মা'বুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। (৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। (৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। (৮) ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। (৯) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (১১) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে। (১২) বরং আপনি বিস্ময় বোধ করেন আর তারা বিদ্রূপ করে। (১৩) যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে না। (১৪) তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে (১৫) এবং বলে, কিছুই নয়, এযে স্পষ্ট যাদু, (১৬) আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (১৭) আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? (১৮) বলুন, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। (১৯) বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র—যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। (২০) এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের। এটাই তো প্রতিফল দিবস। (২১) বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত (২৩) আল্লাহ্ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, (২৪) এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পনকারী। (২৭) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (২৯) তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম বস্তু তওহীদ ঃ সূরাটিতে তওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হল একথা বর্ণনা করা যে, إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (অর্থাৎ, নিশ্চিতই তোমাদের মাবুদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই ঃ- শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোদের, অতঃপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতঃপর শপথ কোরআন তেলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি করা হয়েছে। কেউ বলেন ঃ এখানে আল্লাহ্র পথে জেহাদকারী গাজীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাঁড় করার জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় যিকর তথা তসবীহ্ ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে।

কেউ বলেন ঃ আয়াতে সেসব নামাযীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান ধারণাকে যিকর ও তেলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়।—(তফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্ব্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরও কিছু তফসীর বর্ণিত রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদেরই তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا এটি صف শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন জনসমষ্টিকে এক সরল রেখায় সন্নিবেশিত করা।— (কুরতুবী) কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ্ (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্য পথে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে।—(মাযহারী) কারও কারও মতে এটা কেবল এবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ যখন এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখন সারিবদ্ধ হয়।— (তফসীরে কবীর)

শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, দ্বীনের প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয়। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্ তাআলার এবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিববর্তে এলোমেলোভাবে একত্রিত হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুণটি উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ্ তাআলার খুবই পছন্দনীয়।

নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব ঃ বস্তুত মানবজাতিকেও এবাদতের সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর দেয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (অর্থাৎ, মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না) ।— (তফসীরে মাযহারী)

নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) নামাযে আমাদের কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেন ঃ সোজা হয়ে থাক, আগে পিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে ।—(মুসলিম, নাসায়ী)।

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا বর্ণিত হয়েছে। এটা زجر থেকে উৎপন্ন। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেয়া, অভিশাপ দেয়া। হযরত থানভী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন প্রতিরোধকারী। ফলে এ শব্দের সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌঁছতে বাধা দান করে। খোদ কোরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লেখিত হবে।

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ 'যিকর' এর তেলাওয়াত করে। যিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহ্র স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ নাযিল করেছেন, তারা সেগুলো তেলাওয়াত করে। এ তেলাওয়াত পুণ্য অর্জন ও এবাদত হিসেবেও হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ পয়গম্বরগণের সামনে উপদেশপূর্ণ ঐশী গ্রন্থ তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌঁছান, তাও বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে 'যিকর' – এর অর্থ আল্লাহ্র স্মরণ নেয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।

কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লেখিত বিশেষণ বর্ণনা করে আনুগত্য ও দাসত্বের সব ক'টি গুণই সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ, এবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহ্র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌঁছানো। বলাবাহুল্য দাসত্বের কোন কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লেখিত চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ—একজনই তোমাদের সত্য মা'বুদ।

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ ঃ এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক।

আল্লাহ্ তাআলার নামে শপথ ঃ কোরান পাকে আল্লাহ্ তাআলা ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের শপথ করেছেন। কখনও আপন সত্তার এবং কখনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কোরআন পাকের তফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) এ সম্পর্কে 'আত্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) উসূলে তফসীর সম্পর্কিত 'এতকান' গ্রন্থের ৬৭ তম অধ্যায়ে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তাআলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্যে শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন?

এতকানে আবুল কাসেম কুশায়রী (রহঃ) থেকে এ প্রশ্নের জওয়াবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণাবশতঃই তিনি তা করেছেন। যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

আয়াত শুনে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্র মত মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এই পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شهادة শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন— যেমন, شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ এবং কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা যেমন إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণতঃ শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ্ তাআলার শপথ যে, সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ্ তাআলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন যেমন إِي وَرَبِّي এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে — কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলী এবং কোরআনের শপথ করেছেন, যেমন – وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰىهَا এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টবস্তু আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে

আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে পৃথক নয়।— (ইবনে-কাইয়েম)

বিভিন্ন উদ্দেশে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট বস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন-কোরআন পাকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছেঃ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ইবনে মরদুবিয়্যাহ্ হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন নবী ও রসূলের সত্তার শপথ উল্লেখিত হয়নি; কেবল রসূলে করীম (সাঃ)-এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ – এর শপথও তূর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্যে করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তুর শপথ করা হয়— যেমন, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় এজন্যে যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ্ তাআলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্যে শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ্ তাআলা যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যেও গায়রুল্লাহ্‌র শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ

'আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্ট যে কোন বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুর শপথ করা বৈধ নয়।—(মাযহারী)

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ্ তাআলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরীয়ত সাধারণ মানুষের জন্যে গায়রুল্লাহ্‌র শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সত্য মা'বুদ এক আল্লাহ্। শপথের সাথে সাথে উল্লেখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলো তওহীদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী ছয় আয়াতে আলাদাভাবে তওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ – তিনি পালন-কর্তা আসমানসমূহের, যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, এবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগত তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলীল। এখানে مشارق শব্দটি مشرق এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে।

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ – এখানে السَّمَاءَ الدُّنْيَا অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরী নয় যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই খচিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই খচিত বলেই মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোন শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ্ তাআলা। অতএব আল্লাহ্‌কে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের এবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও যুলুম।

কোরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাঁথা, না আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক কি?- এই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 'সূরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ থেকে فَأَتْبَعَهُ পর্যন্ত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজ-সজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তানরা গায়েবী সংবাদ শোনার জন্যে আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেয়া হয় না। কোন শয়তান যৎসামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতিন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

উল্কাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লেখিত হয়েছে। তবুও এখানে এতটুকু বলে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উল্কাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উত্থিত হয় এবং অগ্নিমণ্ডলের নিকটে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্কাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান নয়, বরং উর্ধ্বজগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা কোরআনের পরিপন্থী নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উল্কাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণতঃ বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিকেই 'উল্কা' (Shooting Star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উল্কা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌঁছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে

প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। উর্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে Meteoriod বলা হয়)। আগষ্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০ শে এপ্রিল, ২৮শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ ও ১৩ই ডিসেম্বরের রাতে হ্রাস পায়।— (আল্ জাওয়াহির)

আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, তাদের সম্পর্কে তানুতাভী মরহুম 'আল্ জাওয়াহির' গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

কোরআন পাক সাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোন কথা বলুক, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একশ্রেণীর জ্ঞানী ও দার্শনিকদের কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু তফসীরবিদগণ তাদের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ গ্রহণ করে কোরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। বরং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ করে কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায় পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের? আমরা কোরআন পাকের এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও অকুণ্ঠচিত্তে এ সত্য স্বীকার করে নেবে।— (আল-জাওয়াহির ১৪ পৃঃ অষ্টম খণ্ড)

আসল উদ্দেশ্য ঃ এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আলোচনার এক উদ্দেশ্য তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ, যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই এবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন পাক অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কোরআন বলে যে, শয়তানদের উর্ধ্ব জগত পর্যন্ত পৌছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কোরআন বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর কোরআন কিরূপে অতীন্দ্রিয়াবদ হতে পারে? এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তওহীদ ও রেসালত উভয় বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে। অতঃপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে।

তওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য ১১ থেকে ১৮ এই আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেয়া হয়েছে। সর্ব প্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত মহান সৃষ্টবস্তুসমূহের মোকাবেলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উল্কাপিণ্ডের ন্যায়, বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্যে মানুষের মত দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনও আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

'আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি'—একথার এক অর্থ এই যে, তাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা, প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ, আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ, উল্লেখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, "আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী পাঁচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রকম প্রমাণ বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ, তাদেরকে মো'জেযা দেখিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত বর্ণনা করে বলা হত, তিনি আল্লাহ্র নবী। নবী কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁর কাছে ঐশী সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেছেন যে, কেয়ামত আসবে, হাশর-নশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ —অর্থাৎ, আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না! কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক , তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ —অর্থাৎ, তারা আপনার নবুওয়ত ও শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে পারে— এমন কোন মো'জেযা দেখলে তাকেও বিদ্রূপচ্ছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলীল আছে। তা এই যে,

وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

অর্থাৎ, এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে

পুনরুত্থিত হব? ফলে আমরা কোনও যুক্তিভিত্তিক দলীল মানি না এবং কোন মোজেযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেন ঃ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دٰخِرُوْنَ অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, হাঁ, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হয়ে জীবিত হবে।

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ্ তাআলা ১৯–২৬ আয়াতসমূহে হাশর–নশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাফের ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

১৯ নং আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ —অর্থাৎ, কেয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবী ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্যে এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশে ইসরাফীল (আঃ)–এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে চালনা করার জন্যে যেমনি কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্যেও এই ফুৎকার দেয়া হবে।—(কুরতুবী)।

যদিও আল্লাহ্ তাআলা শিংগায় ফুঁক দেয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। (তফসীরে–কবীর) কাফেরদের উপর ফুৎকারের প্রভাব হবে এই যে, فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ —সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতো তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে।—(কুরতুবী)।

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ –অর্থাৎ, যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্রিত কর। এখনে সতীর্থদের জন্যে اَزْوَاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ "জোড়া"। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল ব্যবহৃত। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ–এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের 'মুশরিক স্ত্রী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে اَزْوَاجٌ–এর অর্থ সতীর্থই।

এ ছাড়া وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ –বাক্য দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্রিত করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে।

এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ —অর্থাৎ, এদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌছলে পুনরায় আদেশ হবে ঃ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ —এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত রয়েছে।

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফের সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। ২৭–৪০ আয়াতসমূহে একথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ —এ বাক্যে يَمِيْن শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এ ছাড়া يَمِيْن –এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ, শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ্) ভ্রান্ত। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا
قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾
إِنَّهُمْ كَانُوْٓا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُوْلُوْنَ
أَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾ عَلٰى سُرُرٍ
مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ
أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا
أَإِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ
فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾

(৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কতৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (৩১) আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে। (৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে। (৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দা। (৪১) তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুযী (৪২) ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত, (৪৩) নেয়ামতের উদ্যানসমূহ (৪৪) মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। (৪৫) তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র, (৪৬) সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। (৪৭) তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না। (৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণিগণ; (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৫০) অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, (৫৩) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরণিত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ —এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহ্বান জানানোর কারণে আযাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আযাব থেকে নিস্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইন্শাআল্লাহ্ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়।

জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর ৪১-৬১ আয়াতসমূহে জান্নাতীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিবৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জান্নাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

أُولٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ —এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য এমন রুযী তথা খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন।

فَوَاكِهُ শব্দটি فَاكِهَةٌ -এর বহুবচন। (যে ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নয় ; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়, তাকেই আরবী ভাষায় فَاكِهَةٌ বলা হয়। ফল-মূলও স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় 'ফল-মূল'। অন্যথায় এর অর্থ ফল-মূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাযী فَوَاكِهُ শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জান্নাতে যেসব খাদ্য-সামগ্রী দেয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্যে দেয়া হবে—ক্ষুধা মেটানোর জন্যে নয়।

وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ —বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ রিযিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদাসহকারে দেয়া হবে। কারণ, সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ —এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা রাজাসনে মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিত্র কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে।

لَذَّةٌ لِّلشّٰرِبِيْنَ —শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ذات لذة —অর্থাৎ, স্বাদবিশিষ্ট।

এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই পানীয় পানকারীদের জন্যে 'সাক্ষাৎ স্বাদ' হবে।

لَا فِيهَا غَوْلٌ - غَوْلٌ —এর অর্থ কেউ 'মাথাব্যথা' এবং কেউ 'পেটব্যথা' বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ 'দুর্গন্ধ ও আবর্জনা' কেউ 'মতিভ্রম হওয়া' উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লেখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জরীর বলেন, এখানে غَوْلٌ –এর অর্থ আপদ। অর্থাৎ, জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মত কোন আপদ হবে না।

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ —অর্থাৎ, জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জওযী বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, —আমার পালনকর্তার ইয্যতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ্ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লামা ইবনে জওযী قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ –এর আরও একটি অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ, তারা নিজেরা এমন 'অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা' হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না।— (তফসীর যাদুল মাসীর)

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ —এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নীচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এক জান্নাতী ও তার কাফের সঙ্গী ঃ প্রথম দশ আয়াতে জান্নাতীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোন এক জান্নাতীর বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌঁছার পর তার এক কাফের বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে সে জাহান্নামের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে সে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। কোরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, সে কে? এতদসত্ত্বেও কোন কোন তফসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে মুমিন ব্যক্তিটির নাম 'ইয়াহুদাহ' এবং তার কাফের সঙ্গীর নাম 'মাতরূস'। তারাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা কাহ্ফের وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ আয়াতে করা হয়েছে।—(মাযহারী)।

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা ঃ মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফের অথবা খোদাদ্রোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্যে চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ
بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَٰلِكَ
خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ
الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى
الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ
فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾
سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾

(৫৭) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। (৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না (৫৯) আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। (৬০) নিশ্চয় এ-ই মহা সাফল্য। (৬১) এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। (৬২) এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি যালেমদের জন্য একে বিপদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদ্গত হয় জাহান্নামের মূলে। (৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। (৬৬) কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে। ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, (৬৮) অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (৭০) অতঃপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭৪) তবে আল্লাহ্‌র বাছাই করা বান্দাদের কথা ভিন্ন। (৭৫) আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কি চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) এবং তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (৭৮) আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার ঈমানদার বন্দাদের অন্যতম। (৮২) অতঃপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ ঃ এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে বলবে ঃ আমাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না কি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অর্জিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে ঃ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ অর্থাৎ, এমনি ধরনের সাফল্যের জন্যে আমলকারীদের আমল করা উচিত।

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে ৬২-৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ জান্নাতের যেসব নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম?

যাক্কুম কি? যাক্কুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলূসী লিখেন ঃ এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দুতে 'থোহ্‌ড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন' বাংলায় ফণীমনসা নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাক্কুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাক্কুমই জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন ঃ আয়াতে দুনিয়ার যাক্কুমই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাক্কুম হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাক্কুমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহ্যতঃ মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কুমও প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার যাক্কুমের মত হলেও দুনিয়ার যাক্কুম অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টভক্ষ্য হবে।

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ অর্থাৎ, আমি যাক্কুম বৃক্ষকে যালেমদের জন্যে ফেৎনা বানিয়েছি। এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ 'ফেৎনার' অর্থ করেছেন আযাব। অর্থাৎ, এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে ফেৎনার অর্থ 'পরীক্ষা।' উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে? সেমতে আরবের কাফেররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, কাফেরদেরকে যাক্কুম খাওয়ানোর আলোচনাসম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবু জাহ্‌ল তার সহচরদেরকে বলল ঃ তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে

নাও।— (দুররে মনসূর) আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। তাই আবু জাহল বিদ্রূপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ তাআলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিয়ে দিয়েছেন ঃ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ অর্থাৎ, যাক্কুম তো জাহান্নামের গভীরে উদ্গত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরও বিকশিত করে।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ — এতে যাক্কুম ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شَيَاطِينَ এর অনুবাদ করেছেন, সাপ। অর্থাৎ, যাক্কুম ফল সাপের মত হয়ে থাকে। ফণিমনসা এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে شَيَاطِينَ বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাক্কুম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত।

পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উম্মতদের কাছেও সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে ৭৫–৮২ আয়াতে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম হযরত নূহ (আঃ)–এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ – এতে নূহের যে প্রার্থনা বোঝানো হয়েছে যাতে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, "হে পরোয়ারদেগার, পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট রেখো না।" বলে আবেদন জানান।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ — (আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।)

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আঃ)–এর সময়ে আগত জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পর তাঁরই তিন পুত্র থেকে সারা বিশ্বে মানব গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ – (আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে।)–এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আঃ)–এর পরবর্তী লোকদের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্যে নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত আসমানী ধর্ম গ্রন্থে হযরত নূহ (আঃ)–এর নবুওয়ত ও পবিত্রতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করে।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾ اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾
اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ
تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾
فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ
فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ
ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا
تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا
فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾
وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ
قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ
قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ
الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۙ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

(৮৩) আর নূহপন্থীদেরই একজন ছিল ইবরাহীম। (৮৪) যখন সে তার পালনকর্তার নিকট সুস্থ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, (৮৫) যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমরা কিসের উপাসনা করছ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? (৮৭) বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? (৮৮) অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল। (৮৯) এবং বলল : আমি পীড়িত। (৯০) অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। (৯১) অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে ঢুকল এবং বলল : তোমরা খাচ্ছ না কেন? (৯২) তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৯৩) অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। (৯৪) তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্ত্রস্ত পদে। (৯৫) সে বলল : তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? (৯৬) অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। (৯৭) তারা বলল : এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতঃপর তাকে আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ কর। (৯৮) তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। (৯৯) সে বলল : আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন। (১০০) হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে এক সৎপুত্র দান কর। (১০১) সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। (১০২) অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল : বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল : পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (১০৩) যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ্ করার জন্যে শায়িত করল, (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইবরাহীম, (১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ্ করার জন্যে এক মহান জন্তু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূতঃপবিত্র জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র জন্যে অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়তসমূহে তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে ৮৩-৯৮ আয়াতে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বটে।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ — মৌলিক মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতিতে একমত লোকের দলকে আরবী ভাষায় شيعة বলা হয়। এখানে شِيْعَتِهٖ শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ নূহ (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পূর্বসূরী পয়গম্বর নূহ (আঃ)-এর পন্থাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়েরই পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই রকম অথবা কাছাকাছি ছিল। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মাঝে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝে হযরত হুদ ও সালেহ্ (আঃ) ব্যতীত কোন নবী আবির্ভূত হননি।—(কাশ্‌শাফ)

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ — এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে, যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহ্র নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহ্র দিকে রুজু করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর এবাদত করা। এর সাথে "পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে" কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কোন এবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ এবাদতকারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ — এসব আয়াতের পটভূমিকা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। নির্ধারিত পরবের দিনে তারা ইবরাহীম (আঃ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন।—(দুররে মনসূর, ইবনে জরীর) কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন যে, গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। হয়তো বা এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। এ উদ্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতঃপর বললেন : আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে ছেড়ে উৎসবে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফেকাহ্ সংক্রান্ত আলোচনার

সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে সেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হল।

তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্য ঃ সর্ব প্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব দেয়ার পূর্বে ইবরাহীম (আঃ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেন ঃ এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যতঃ অমলিন মনে হলেও কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেয়া কঠিন। কারণ, প্রথমত ঃ কোরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। তাই এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও নেই, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারকারাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টে فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ বলা উচিত ছিল — فِي النُّجُومِ নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)–এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাই কোরআন পাকও গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াবে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তাই তারকারাজি দেখে দেখে জওয়াব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইবারহীম (আঃ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন বরাত দেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম–গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ)–এর এই কর্ম দ্বারা হয়তো সে কাফেররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে। যারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ–কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জওয়াব এই যে, কাফেররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম (আঃ) পরবর্তী সময়ে পরিষ্কারভাবে তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল, তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকররূপে দেয়ার উদ্দেশে। সেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতা পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা কাফেরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আসল লক্ষ্য ছিল উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের জন্যে অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

ইবরাহীম (আঃ)–এর অসুস্থতার তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জওয়াবে বলেছিলেন ঃ إِنِّي سَقِيمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কোরআন পাকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ্ বুখারীর এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে, তিনি একথা কেমন করে বললেন?

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) – ''তওরিয়া'' করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে ইবরাহীম (আঃ)–এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, 'আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে তাঁর মনে সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে سَقِيمٌ শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা مريض শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হাল্কা। 'আমার মন খারাপ বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলাবাহুল্য, এ বাক্যে 'মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, إِنِّي سَقِيمٌ বলে ইবরাহীম (আঃ)–এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় اسم فاعل এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ হল, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) إِنِّي سَقِيمٌ এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, ''আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।'' একথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন–মেজাযে ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলী অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। ইবরাহীম (আঃ)–এর তওরিয়া এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)–এর উক্তি إِنِّي سَقِيمٌ এর জন্যে كذبة (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার–আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে ঃ

এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও

সমর্থনে বলা হয়নি।

এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে كذب শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ার بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

তওরিয়ার শরীয়তসম্মত বিধান : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ বিষয়টি জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়া করা জায়েয। তওরিয়া দুই প্রকার। (এক) – উক্তিগত। অর্থাৎ, এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। (দুই) – কর্মগত। অর্থাৎ, এমন কাজ করা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বোঝে নেয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে ' 'ঈহাম''-ও বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টিপাত করাও অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তওরিয়া।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় প্রকার তওরিয়া স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে ছিলেন এবং কাফেররা তাঁর সন্ধান করছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল : ইনি কে? হযরত আবু বকর জওয়াব দিলেন : هو هاد يهديني "ইনি আমার পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান।" এতে লোকটি সাধারণ পথপ্রদর্শক বোঝেই চলে যায়। অথচ হযরত আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল, "ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক।"—(রুহুল মা'আনী)

এমনিভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জেহাদের জন্যে কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল জানতে না পারে। এটা ছিল কর্মগত তওরিয়া তথা ঈহাম।— (মুসলিম)

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে তওরিয়ার প্রমাণ আছে। শামায়েল তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুকচ্ছলে বললেন : কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন : বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না – ষোড়শী যুবতী হয়ে যাবে।

পুত্র কোরবানীর ঘটনা : ৯৯–১১৩ আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র জন্যে তাঁর একমাত্র পুত্রের কোরবানী পেশ করেছিলেন। এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي .... — (ইবরাহীম (আঃ) বললেন : আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের দিকে চললাম।) দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় লূত (আঃ) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদেগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ দারুল-কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদেগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর এবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌছলেন। তখনো পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন সন্তান ছিলনা। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (পরওয়ারদেগার, আমাকে সৎপুত্র দান কর।) তাঁর এ দোয়া কবূল হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এক পুত্রের সুসংবাদ দেন।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ — (অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।) "সহনশীল" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের ঘটনা এই : হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তাঁর গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যাই মনে করলেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্যে দান করেছিল। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার নাম রাখেন ইসমাঈল।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

— (অতঃপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন : বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে উপর্যুপরি তিন দিন দেখানো হয়।— (কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীই বটে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম হয়েছে। এ হুকুমটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন।—(তফসীরে-কবীর)

এছাড়া এখানে আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে যবেহ্ করা ছিল না কিংবা ইবরাহীম (আঃ)-কেও এ আদেশ দেয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই যবেহ্ করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল যে, নিজের পক্ষ থেকে যবেহ্ করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে যবেহ্ করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুতঃ এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বোঝে নিলেন যে, যবেহ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ্ করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হল। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিত করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্যে এখানে فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, অনেক কামনা-বাসনা ও দোয়া-প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলা-ফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল আপদে-বিপদে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানোর। তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে

সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন। — (মাযহারী)

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ (অতএব তুমিও ভেবে দেখ, তোমার অভিমত কি?) হযরত ইবরাহীম (আঃ) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্যে জিজ্ঞেস করেননি যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন। বরং প্রথমতঃ তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, এ পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়তঃ পয়গম্বরগণের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্যে সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম (আঃ) পূর্বাহ্নে কিছু না বলেই পুত্রকে যবেহ্ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ্‌র ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্মত করা যাবে।—(রূহুল মা'আনী, বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন খলীলুল্লাহ্‌রই পুত্র, ভাবী পয়গম্বর। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (পিতঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সামনে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের বরাত দেননি—বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু ইসমাঈল (আঃ) বোঝে নিলেন যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।) এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ তিনি "ইনশাল্লাহ্" বলে ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবীর যে বাহ্যিক আকার ছিল, তাও খতম করে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একথাও বলতে পারতেন, "ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন", কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, "সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং দুনিয়াতে আরও বহু সবরকারী হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার, ও অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন।—(রূহুল মা'আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন দাবী করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে নিজের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা প্রকাশ পায়।

فَلَمَّا أَسْلَمَا (যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) اسلام শব্দের অর্থ নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে যবেহ্ করতে এবং পুত্র যবেহ্ হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্ম নিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েতে জানা যায় যে, শয়তান তিন বার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিন বার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়েই যখন এই অভিনব এবাদত উদযাপন করার উদ্দেশে কোরবানগাহে পৌঁছলেন,তখন ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে বললেন, পিতঃ আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশী ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ বৎস,আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার জন্যে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন।

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ – (এবং তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে এমনভাবে শুইয়ে দিলেন, যাতে কপালের এক দিক মাটি স্পর্শ করেছিল। (মাযহারী) আভিধানিক দিক দিয়ে এ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, আরবী ভাষায় جبين কপালের দুই পার্শ্বকে বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলকে বলা হয় جبهة এ কারণেই হযরত খানভী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন, বালুর উপর শুইয়ে দিলেন।" কিন্তু অন্যান্য কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ করেছেন "উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।" যাই হোক ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে এভাবে শোয়ানোর কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, শুরুতে ইবরাহীম (আঃ) তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন, কিন্তু বার বার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটছিল না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন পিতঃ আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে গলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাকে এভাবে শুইয়ে ছুরি চালাতে থাকেন।—(মাযহারী)

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا — আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি নিজের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি রাখনি। (স্বপ্নেও সম্ভবতঃ এ বিষয়টিই শেখানো হয়েছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) যবেহ্ করার জন্য পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন।) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ
بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ
مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ
بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ
إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

(১০৮) আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১১০) এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বন্দাদের একজন। (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সৎকর্মীদের মধ্য থেকে একজন নবী। (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী। (১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি। (১১৫) তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার করেছি মহা সংকট থেকে। (১১৬) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই ছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি তাদের জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বন্দাদের অন্যতম। (১২৩) নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রসূল। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা কি ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি 'বা'আল' দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) যিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? (১২৭) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১২৮) কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি বন্দাগণ নয়। (১২৯) আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১৩১) এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩৩) নিশ্চয় লূত ছিলেন রসূলগণের একজন।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ — (আমি খাঁটি বন্দাদেরকে এমনি প্রতিদিন দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ, আল্লাহ্র কোন বন্দা যখন আল্লাহ্র আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্থিব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ — (আমি যবেহ্ করার জন্যে এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) উপরোক্ত গায়েবী আওয়ায শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়ানো দেখলেন।

মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে দেয়া হলে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। একে عَظِيمٍ (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না!—(মাযহারী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ — (তাঁদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোন সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এটা মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের উপর ভিত্তিশীল।

১১৪–১২২ আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) সম্পর্কিত। এ ঘটনা ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বন্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আল্লাহ্ তাআলা মূসা ও হারূন (আঃ)–এর প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে—(এক) ধনাত্মক নেয়ামত, অর্থাৎ, উপকারী وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ — আয়াতে এধরনের নেয়ামতের দিকে ইংগিত রয়েছে। (দুই) ঋণাত্মক নেয়ামত। অর্থাৎ, ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নেয়ামত। পরবর্তী নেয়ামতসমূহে এ ধরনের নেয়ামতেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) ঃ ১২৩–১৩২ আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর বর্ণনা। আয়াতসমূহের তফসীরের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর আলোচনা দেখা যায়—সূরা আনআমে ও সূরা সাফফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আনআমে কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তফসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়,এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত।

অল্প সংখ্যক তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস (আঃ)–এরই অপর নাম, এই দু'ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ) অভিন্ন ব্যক্তি। (দুররে মনসূর) কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ দু'টি উক্তিই খণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রসূল, এটাই সহীহ্।—(আলবেদায়াওয়ান্নেহায়া)।

নবুওয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান ঃ হযরত ইলিয়াস (আঃ) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিযকীল (আঃ)–এর পর এবং হযরত আল্ইয়াস' (আঃ)–এর পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আঃ)–এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ্' অথবা 'ইয়াহুদিয়্যাহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল–মোকাদ্দাসে অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাঈল'। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ্ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) জর্দানে 'অলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে আখিয়াব এবং আরবী ইতিহাসে 'আজিব' অথবা 'আখিব' বলে উল্লেখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবীল 'বা'আল' নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তওহীদ প্রচার করার এবং বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।—(তফসীরে ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, মাযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন)।

স্ব সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ ঃ অন্যান্য পয়গম্বরগণকেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে কোরআন পাকে এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণদানের পরিবর্তে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিবৃত হয়েছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত তফসীরিসমূহের মধ্যে তফসীরে মযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কা'বে আহ্বার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার–সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থী ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ঈযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। ফলে তিনি সুদূর এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে যদি তিনি তাদেরকে মো'জেযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্র আদেশে সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহ্র নাফরমানী। তোমরা এখনও নাফরামানী থেকে বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ' নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা বা'আল–এর নামে কোরবানী পেশ করুক আর আমি আল্লাহ্র নামে কোরবানী পেশ করব। যার কোরবানী আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সেমতে "কোহে করমল" নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হল। বা'আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কোরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশে অনুনয়–বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) কোরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে তা ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সেজদায় পড়ে গেল। তাদের সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য গ্রহণ করল না; ফলে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্নী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর শত্রু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী–ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌঁছে দ্বীনের তবলীগ আরম্ভ করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পূজার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহুরামও হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেয়া হল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তার পয়গম্বরকে তুলে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি ? ইতিহাসবিদ ও

তফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তফসীরে মাযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)–কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আঃ)– এর মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আহবার বর্ণনা করেন যে, চার জন পয়গম্বর এখনো জীবিত আছেন। হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস–এ দু'জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মনসূর) এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল–মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোযা রাখেন।— (কুরতুবী)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলেমগণ এসব রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মনে করেননি।

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর শিক্ষা এই যে, ''এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।'' ইলিয়াস (আঃ)–এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই উচিত।

আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্যণীয় —

أَتَدْعُونَ بَعْلًا (তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) ''বা'আল''–এর আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক ইত্যাদি কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আঃ)–এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমূর্তির নাম ছিল। বা'আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মূসা (আঃ)–এর যমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পূজা হত এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর— বা'আলবাক্কাকেও এ দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।—(কাছাছুল–কোরআন)

وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলা। ''সর্বোত্তম স্রষ্টা''–এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কোন স্রষ্টা হতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে তোমরা স্রষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি ওদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।—(কুরতুবী) কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে خالق শব্দটি صانع (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা, অন্যান্য নির্মাতারা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোন বস্তু তৈরী করে। কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে আস্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।—(বয়ানুল–কোরআন)

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয় ঃ এখানে স্মর্তব্য যে, خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব ক্ষমতায় অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। অন্য কারও সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ হতে পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত—সৃষ্টি নয়।

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ — (অতঃপর ওরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে ওদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র সত্য রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)–কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ্ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্যই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ – এখানে مخلصين শব্দের লাম–এর উপর 'যবর' রয়েছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও সওয়াবের জন্যে খাঁটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা ''মনোনীত'' করা অধিক সমীচীন।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ''ইলিয়াসীন'' ও ইলিয়াস (আঃ)–এর আর এক নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে ''ইয়া'' ও ''নূন'' বর্ণ সংযুক্ত করে দেয়। যেমন, سينا থেকে سنين বলে। এখানেও তেমনি দু'টি বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৩৩–১৩৮ আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আঃ)–এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দুমের সে এলাকা দিবারাত্রি অতিক্রম কর, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না। 'সকাল' ও 'সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণতঃ এ সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবু সাঈদ বলেন ঃ খুব সম্ভব সাদ্দুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হত এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত।— (তফসীরে–আবু সউদ)

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ
دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى
الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ
مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ
إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾
وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ
مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

(১৩৪) যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; (১৩৫) কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে অন্যান্যদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। (১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় (১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বোঝ না? (১৩৯) আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন। (১৪০) যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (১৪১) অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (১৪২) অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (১৪৩) যদি তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (১৪৫) অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। (১৪৬) আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। (১৪৭) এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। (১৪৮) তারা বিশ্বাস স্থাপন করল অতঃপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (১৪৯) এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার পালনকর্তার জন্যে কি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কি পুত্র-সন্তান? (১৫০) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, (১৫২) আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র-সন্তানের স্থলে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অনুধাবন কর না? (১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব আন। (১৫৮) তারা আল্লাহ্ ও জ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে। (১৫৯) তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বন্দা, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩৯-১৪৮ সুরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শেষভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের ঘটনার পূর্বেই রসূল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রসূল হন। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ — (যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী বোঝাই নৌকার দিকে। اباق শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জন্যে এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ,আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বন্দা। তাঁদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَسَاهَمَ - (অর্থাৎ, তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। (এই সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেয়া হোক। কাকে ফেলে দেয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে?

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ — (অতঃপর তিনি পরাজিত হলেন।) ادحاض এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তাঁরই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্মহত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ, নদীর কিনারা সম্ভবতঃ নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌঁছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ - এ আয়াত থেকে একথা অনুমান করা ঠিক নয় যে, ইউনুস (আঃ) তসবীহ্ পাঠ না করলে মাছটি কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আঃ)-এর কবর হয়ে যেত।

তসবীহ্ ও এস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় ঃ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ্ ও এস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ — এ কলেমার বরকতেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যেই বুযুর্গগণের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের

সময় উল্লেখিত কলেমা সোয়া লাখ বার পাঠ করেন। এর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা বিপদ দূর করেন।

আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পঠিত দোয়া যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে।—(কুরতুবী)

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ — (অতঃপর আমি তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আঃ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ -(আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদগত করে দিয়েছিলাম।) কাণ্ডবিহীন বৃক্ষকে يَقْطِيْنٍ বলা হয়। রেওয়ায়েয়েতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। شَجَرَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ্ তাআলা লাউ গাছকেই কাণ্ডবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ — (আমি তাকে এক লাখ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। হযরত থানভী (রাঃ) বলেন ঃ এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভগ্নাংশও গণনা করা হলে এক লাখের কিছু বেশী ছিল।—(বয়ানুল-কোরআন)

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস (আঃ) এ ঘটনার পরে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। আল্লামা বগভী এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিক প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই ইউনুস (আঃ)-এর রেসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রসুল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ — (বস্তুতঃ তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) "কিছুকাল পর্যন্ত" উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন তারা আযাব থেকেও বেঁচে রইল।

এপর্যন্ত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী, উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল। এখন ১৪৯-১৬৬ আয়াতে আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরণের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা এবং জ্বিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী বলেন ঃ এ বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনু সালমা, বনু-খোযা'আ ও বনু সালীহ্দের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।—(তফসীর-কবীর)

فَاسْتَفْتِهِمْ ..... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ এসব আয়াতে কাফেরদের উপরোক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্যে লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্র জন্যে কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছ। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে কি? কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিন রকম দলীল হতে পারে—(১) চাক্ষুষ দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাৎ, এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন স্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তাই জানা সম্ভব নয়।

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ - আয়াতের মর্ম তাই। ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং তাদের উক্তি দলীল হতে পারে না।

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ — আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তিগত দলীলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, স্বয়ং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র-সন্তানের মোকাবেলায় কন্যা-সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টজগতের সেরা তিনি নিজের জন্যে হীন বস্তু কেমন করে পছন্দ করতে পারেন? اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোন্ আসমানী কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতের অর্থ তাই।

হঠকারীদের জন্যে আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবী তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে, সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্যে একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলাবাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলার মতেও কন্যা-সন্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যাসন্তান না বলে পুত্র-সন্তান বললে সঠিক হত। বরং এটা ইলযামী জওয়াব, যার